সমীক্ষণ

# ‘অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়-পুর’

প্রসাদ

Swami Chetanananda, *SRI RAMAKRISHNA : A Divine Life in Pictures*, 2021, Vedanta Society of St. Louis, Page : 232, Price : $ 39.95. প্রাপ্তিস্থান : অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা, ১২০০ টাকা।

‘ভয় হতে তব অভয়মাঝে নূতন জনম দাও হে’

এক অতিমারির উপর্যুপরি তরঙ্গাঘাতে সমগ্র বিশ্ববাসী আজ প্রাণভয়ে প্রকম্পিত। এই বিপন্ন, বিপর্যস্ত সময়েই আমাদের খুব বেশি করে প্রয়োজন একটি চিরন্তন আশ্বাসের আশ্রয়স্থল, যেখানে আমরা নতুন করে উজ্জীবিত হওয়ার বিশল্যকরণী পেতে পারি। আমাদের আর্ত জিজ্ঞাসা—‘‘জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই?’’ কিন্তু আছে কি সেই পরম আশ্রয়স্থল? আছে বই কী! এই ঘোর দুঃসময়ে স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ সুদূর সমুদ্রপার থেকে এই সুমুদ্রিত মহাগ্রন্থটি আমাদের ভয়কম্পিত হস্তে তুলে দিলেন। অসহায় মানুষের আর্ত অনুচ্চারিত প্রার্থনারই পরমকাঙ্ক্ষিত উত্তরে স্বয়ং যুগাবতারই যেন নতুন করে বরাভয়মূর্তিতে এসে দাঁড়ালেন তাঁর এই নতুন চিত্রগত জীবনীর মাধ্যমে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।২৬।২) একটি মূল্যবান উক্তি আছে—‘‘আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।/ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।’’ সরল কথায় এর তাৎপর্য : আহার শুদ্ধ হলে আমাদের মনও (সত্ত্ব) শুদ্ধ হয়, সেই শুদ্ধ মনে সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই ভগবানের কথা মনে পড়ে, আর তখনই আমাদের মন সবরকম গ্রন্থি (যাদের আজকের ভাষায় complex বলতে পারি) থেকে মুক্ত হয়।’’ ঔপনিষদিক অর্থে, ‘আহার’ মানে কিন্তু কেবলমাত্র স্থূল ভোজনকর্মই নয়, প্রতিমুহূর্তে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু গ্রহণ বা আহরণ করি—অর্থাৎ, যা কিছু দেখি, শুনি, আঘ্রাণ করি, আস্বাদন করি বা স্পর্শ করি—তা-ই ‘আহার’; ‘আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ’।

সন্দেহাতীতভাবে এই নতুন অ্যালবামটি আমাদের চোখের এবং মনের ‘আহার’, শুদ্ধ আহার, পরিবেশন করছে। এই দুঃসময়ে যখনই একটু সময় পাব, তখনই যদি আমরা বইটি খুলে এর কয়েকটি পাতা দেখতে বা পড়তে পারি, তাহলে সেই বিশুদ্ধ ‘আহার’ (দৃশ্যগত) আমাদের সত্ত্বকে এবং সত্তাকে

আমাদের অজান্তেই বিশুদ্ধ করে দিতে থাকবে। এইভাবে ক্রমে মন বিশুদ্ধ হয়ে গেলে আমাদের পক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাধ্যানে নিমগ্ন হওয়া সহজতর হবে—'মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে'।

'নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে...'

এই বইটির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করার আগে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে—জীবনী (Biography) আর চিত্রগত জীবনীর (Pictorial Biography) মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

এর উত্তরে বলা যায়, জীবনীগ্রন্থে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনকাহিনী, জীবনদর্শন ও জীবনভাষ্যের ভাষাগত বর্ণনাই মুখ্য, এর সঙ্গে তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজ, সময় এবং পরিস্থিতির ঐতিহাসিক বিবরণও থাকতে পারে। এই জীবনকাহিনীকে আরও ভালভাবে পরিস্ফুট করবার জন্য এবং সেই সঙ্গে, সেটি পাঠকের কাছে আরও বেশি হৃদ্য করবার জন্য সচিত্র জীবনীতে একাধিক সুনির্বাচিত ছবিও পরিপূরক হিসাবে থাকে। গায়ক-গায়িকার কণ্ঠনিঃসৃত গায়নের সঙ্গে সুসংগত তালবাদ্য মিলিত হয়ে যেমন সুমধুর সংগীতের সৃষ্টি হয়, ভাষা আর চিত্র মিলিত হয়েও তেমনি একটি সার্থক চিত্রশোভিত জীবনীগ্রন্থ তৈরি হয়।

এর বিপ্রতীপে, চিত্রগত জীবনীতে ছবিকেই মুখ্যস্থান দেওয়া হয়, ভাষাগত ভাষ্য (textual commentary) থাকে সেইসব ছবির পরিপূরক রূপে। এতে স্বাভাবিকভাবে চিত্রের সংখ্যা বেশি, তার সঙ্গে ন্যূনতম এবং একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু ভাষাগত বিবরণ। সাংগীতিক উপমায় একে বলতে পারি—তবলা লহরা, সেখানে সুদক্ষ তবলাবাদকের তালবাদ্যই মুখ্য, আর তার সঙ্গে সুর ধরে রাখার জন্য অন্য কোনও বাদ্যযন্ত্র (এসরাজ বা হারমোনিয়াম) বাজানো হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিত্রজীবনী কি আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি?

উত্তর : অবশ্যই হয়েছে। ১৯৭৬ সালে মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এমন একটি চিত্রজীবনী (SRI RAMAKRISHNA : A Biography in Pictures)। সেটি শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী চেতনানন্দজীর যৌথ পরিশ্রমের ফসল। পাঠকসমাজ সহর্ষে এই মহাগ্রন্থটিকে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। অবিলম্বে তার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজি এবং বাংলা উভয় সংস্করণের জনপ্রিয়তা আজও অম্লান।

আজ থেকে ৪৬ বছর আগে (মার্চ, ১৯৭৬) যে-কথাগুলি ইংরেজি অ্যালবামের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল তার প্রাসঙ্গিকতা আজও হারায়নি :

"...Sri Ramakrishna was perhaps the only God-man who was photographed. Today none need to imagine how he looked. Photos of him are available for all of us to see. Moreover, many places and persons connected with his life have been photographed at different times. Thanks to the camera, we thus have accurate aids for reconstructing the right milieu in which Sri Ramakrishna lived and moved..."

আজকের দিনের উন্নত প্রযুক্তির আশীর্বাদধন্য হয়ে এই কথাগুলির সঙ্গে কয়েকটি বাড়তি শব্দ যোগ করে বলা যেতে পারে : ''...Thanks to the camera of the olden days and the advanced computer technology of today, we thus have accurate aids for reconstructing the right milieu in which Sri Ramakrishna lived and moved..."

এরপর চেন্নাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর

এবং শ্রীশ্রীমায়ের একটি যৌথ চিত্রজীবনী প্রকাশিত হয়েছিল।[১] এরও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।[২]

তৃতীয় প্রশ্ন, এই রকমের একাধিক জনপ্রিয় প্রকাশনা যখন রয়েছে, তখন স্বামী চেতনানন্দজীর এই নতুন বইটির সার্থকতা কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। পরমপূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ (১৯০৮-২০০৫) বলতেন, অধিকাংশ বিখ্যাত মানুষ তাঁদের মৃত্যুর পরে ধীরে ধীরে জনগণের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হতে থাকেন, কেবলমাত্র ইতিহাসের পাতায় তাঁদের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু, অবতারদের ক্ষেত্রে এর বিপরীতটা ঘটে। তাঁদের জীবদ্দশায় হয়তো খুব কম মানুষই তাঁদের চিনতে পারেন। (আমরা দেখেছি, নিজের অবতার-স্বরূপের ইঙ্গিত দিয়ে ঠাকুর নিজেকে বলতেন—'অচিনে গাছ'; অথবা, কৌতুকপূর্ণ স্বরে গান গেয়ে প্রশ্ন করতেন—'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?') আমাদের মতো সাধারণ মানুষ অবতারকে চিনতে শেখেন তাঁর মানবলীলা শেষ হওয়ার পরে। শুধু তাই নয়, যত দিন যায়, ততই জনমানসে অবতারদের প্রভাব বাড়তে থাকে। তাঁদের কথা জানবার জন্য ভক্তদের আকুলতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তাঁরা কেমন মানুষ ছিলেন, কেমন ছিলেন তাঁদের আত্মীয়-পরিজন, কেমন ছিল তখনকার পরিবেশ, কী কী জিনিস ব্যবহার করতেন তাঁরা, কী খেতে ভালবাসতেন—এইসব ছোটখাট তথ্য জানবার জন্য ভক্তজন পাগলের মতো অনুসন্ধান করতে থাকেন। এই যেমন, প্রভু যিশুখ্রিস্ট মর্ত্যলীলা করে গেছেন দু-হাজার বছর আগে, তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাতেও তাঁর অনুগামীরা হতোদ্যম না হয়ে দীর্ঘদিন ধরে অনেক কষ্টসাধ্য গবেষণা করে চলেছেন, আবিষ্কার করছেন নানা অজানা তথ্য। এসবের ওপরে ভিত্তি করে শুধুই যে গুরুভার গবেষণাগ্রন্থ লেখা হচ্ছে তা নয়, তাঁর অসামান্য চিত্রজীবনীও প্রকাশিত হচ্ছে।

পক্ষান্তরে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব (১৮৩৬-১৮৮৬) আমাদের এই বাংলার মাটিতে লীলা করে গেছেন মাত্র দেড়শো বছর আগে। তাহলে, তাঁরও এইরকম কোনও বিস্তৃত গবেষণা-ঋদ্ধ চিত্রজীবনী প্রকাশ করা যায় না?—ঠাকুরের দেশ-বিদেশের ভক্তদের মনে এই রকম একটা ব্যাকুল বাসনা দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। ভক্তপ্রাণের এই ইচ্ছার কথাটা স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ খুব ভালই জানেন। আমাদের সকলের সেই ইচ্ছেটাই তিনি পূর্ণ করে দিলেন তাঁর এই নতুন চিত্রজীবনীর মাধ্যমে।

চতুর্থ প্রশ্ন, এই বইটিতে কী আছে? এবারে সেই আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

## 'নও ছবি, নও শুধু ছবি'

আলোচ্য বইটি পড়তে গেলেই আলোচকের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। এর প্রতিটি আয়তাকার (২৮ সেমি. x ২৪ সেমি.) পৃষ্ঠায় রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার নানারকম জানা-অজানা নিদর্শন, সেইসব পবিত্র চিত্রাবলি দেখতে দেখতে কখন যেন তার মৃত্যুত্রস্ত মন সকল শঙ্কা থেকে মুক্তি পেয়ে, সমস্ত পার্থিব দুশ্চিন্তার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে ঠাকুরের অভয়চরণে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে। মনে হয়, এই কঠিন সময়ে শুধু বইটি খুলে পাতার পর পাতা পড়ে যাওয়াটাই যেন একটা বড় সাধনা—পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রয়লাভের মহাসাধনা, মৃত্যুপুরী থেকে অমৃতলোকে গমনের অনন্ত আশ্বাস। আলোচকের দৃঢ় বিশ্বাস, এই বইটি পড়লে আপনাদেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হবে।

কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি, আজ থেকে উনিশ বছর আগে পূজনীয় লেখক আমাদের উপহার দিয়েছিলেন এক মহাগ্রন্থ : Sri Ramakrishna

and His Divine Play। মূলত এটি স্বামী সারদানন্দজীর লেখা অমর ক্লাসিক গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ (আধুনিক ইংরেজি ভাষায়)। এই সুবিশাল বইটিতে (পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১০০৮) এত রকম নতুন তথ্য এবং ছবির—যার মধ্যে বেশ কিছু ছবি সত্যিই দুষ্প্রাপ্য—অভাবিত সন্নিবেশ ঘটেছে যে একে মূল 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এর এক অভিনব পুনর্নির্মাণ বলা যেতে পারে।

আলোচ্য বইটি ওই একই ধারায় আর একটি আনন্দদায়ক সংযোজন। দুটি বই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েও একে অপরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম বইটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা এই নতুন বইটি পড়তে উৎসাহিত হবেন ঠাকুরের লীলাস্থলের, শিষ্য-শিষ্যাদের এবং তাঁর লীলার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যক্তি ও বস্তুর ছবি দেখার জন্য। আবার এই বইটি যাঁরা প্রথমে পড়বেন, তাঁরা যখন আরও গভীর এবং বিস্তৃতভাবে ঠাকুরকে জানতে বা বুঝতে চাইবেন, তখন তাঁদের আগের বইটি পড়তে হবে। বস্তুত, আজকের পাঠক-পাঠিকারা যদি এই দুটি বই মন দিয়ে পড়েন, তাহলে তাঁদের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যলীলার তাৎপর্য আরও ভাল করে প্রণিধান করা সহজ হবে।

সেন্ট লুইসের বেদান্ত সমিতি বহু অর্থ ব্যয় করে এই অনন্য অ্যালবামটি প্রস্তুত করেছেন।[৩] এর জন্য মহারাজ এবং তাঁর টিমের অন্যান্য ভক্তরা প্রায় তিন বছর (২০১৮-২০২১) ধরে যে কঠিন পরিশ্রম (নাকি সাধনা) করেছিলেন তার কিছুটা আভাস তিনি দিয়েছেন তাঁর কয়েকটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায়।[৪] পূজনীয় মহারাজ এবং সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটির সকল সদস্যের নিত্য মঙ্গল হোক।

গত ছয় দশক ধরে অসীম ভালবাসা আর ধৈর্য নিয়ে চেতনানন্দজী একটি প্রয়োজনীয় কাজ করে চলেছেন—তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, স্থান এবং বস্তুর ছবি তুলে রাখছেন। এইভাবে, তিল তিল করে সংগ্রহ করতে করতে আজ তাঁর কাছে সযত্নে রক্ষিত ছবি বা স্লাইডের সংখ্যা দশ হাজার হয়ে গেছে। এর থেকে ৬৩৯টি ছবিকে বিশেষভাবে নির্বাচন করে এই অ্যালবামে স্থান দেওয়া হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে প্রতিটি ছবির সঙ্গে তার পরিচায়িকা (caption) তো আছেই, উপরন্তু সেই বিশেষ ব্যক্তি, স্থান বা বস্তু সংক্রান্ত কিছু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বা তথ্যও (narration) মুদ্রিত হয়েছে। এইভাবেই চিত্র এবং জীবনেতিহাসের মেলবন্ধন ঘটেছে এই অসামান্য চিত্রজীবনীতে।

### 'রামকৃষ্ণ নামের বান ডেকেছে ভাই'

প্রথমে এই প্রচ্ছদশোভন বইটির মলাট (Jacket) থেকে শুরু করা যাক। বইটির জ্যাকেটের ডিজাইন অপূর্ব, হাতে নিলেই মন এক অপার্থিব আনন্দে ভরে যায়। জ্যাকেটের সম্মুখভাগের ডিজাইন প্রথমেই যেন সমগ্র বিষয়বস্তুর কথা ইঙ্গিতে বলে দিচ্ছে। ফোটোগ্রাফি-কমপোজিশনের প্রচলিত 'তৃতীয়াংশের নিয়ম' (Rules of Thirds) অনুসারে এর ওপরের দুই-তৃতীয়াংশে অনন্তের ব্যঞ্জনাবহ নিঃসীম নির্মল নীলাকাশ। নিচের এক-তৃতীয়াংশে পতিতোদ্ধারিণী মা গঙ্গা। উত্তরবাহিনী ভাগীরথীতে তখন ভরা কোটাল—নব্যযুগের আধ্যাত্মিক ভাবের (যার মূল কথা—'যত মত তত পথ' এবং 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা') জোয়ারের প্রতীক। যেখানে দ্যুলোক এবং ভূলোক এসে মিলিত হচ্ছে, সেই চক্রবালে (skyline) আমাদের চিরপরিচিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। তার ঠিক মধ্যাংশের কেন্দ্রমণি মা ভবতারিণীর মন্দির। চাঁদনীর উত্তরে দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছয়টি মন্দির দৃশ্যমান। জ্যাকেটের দক্ষিণপার্শ্বে ঠাকুরের অভয়প্রদ মুখচ্ছবি (রাধাবাজারের বেঙ্গল

ফোটোগ্রাফার্সের স্টুডিওতে তোলা ছবির অংশ)। ঠাকুর যেন জীবোদ্ধারকল্পে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী থেকে উত্থিত হচ্ছেন। প্রশংসনীয় কারিগরি-দক্ষতায় ছবিটি ডিজিটালি এনলার্জ করা হয়েছে, ঠাকুরের নেত্রদ্বয় অর্ধ-উন্মীলিত এবং তাঁর নাতিদীর্ঘ শ্মশ্রুশোভিত পরিচিত আননে এক অপার্থিব আনন্দের বিভা। মুক্তিদাতা, মুক্ত দেবাঙ্গন এবং মুক্ত প্রকৃতি—সব মিলিয়ে যেন এক দিব্য সিমফনি!

জ্যাকেটের পেছনের ডিজাইনও মনোমুগ্ধকর। কর্মচঞ্চল দক্ষিণেশ্বরের বিপ্রতীপে সেখানে দেখতে পাচ্ছি ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় কামারপুকুর গ্রামের স্নিগ্ধসুন্দর চিত্র। এখানেও ‘তৃতীয়াংশের নিয়ম’ (Rules of Thirds) অনুসৃত হয়েছে। ওপরের এক-তৃতীয়াংশে রয়েছে মেঘমুক্ত অরুণোদ্ভাসিত অম্বর, সেখানে প্রথম আলোর চরণধ্বনি বেজে উঠে যেন পরমপুরুষের অভয়বার্তা ঘোষণা করছে। সামনে নিস্তরঙ্গ জলাশয়—যাকে গ্রামবাংলার প্রশান্ত জীবনযাত্রার প্রতীক বলা যেতে পারে। সেই অচ্ছোদ জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত শ্যামলবরণ কোমলমূর্তি কামারপুকুরের দিগন্তরেখা—পরব্রহ্ম এবং তাঁর প্রতিফলন এই ব্যক্ত জগতের প্রতীক।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ‘জল’-কে মোটিফ হিসাবে নিয়েছেন লেখক চেতনানন্দজী এবং গ্রাফিক শিল্পী ডায়েন মার্শাল। প্রবহমান নদীই হোক বা স্থির জলাশয়ই হোক, ‘জল’ এখানে জীবনের প্রতীক—গভীরতা, শীতলতা, স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার দ্যোতক। তরঙ্গায়িত জলরাশিকে যদি কর্মচঞ্চল জীবনের প্রতীক হিসেবে ধরি, তাহলে তরঙ্গহীন স্থির জলরাশিকে যোগীর বৃত্তিশূন্য চিত্তের সঙ্গে তুলনা করতে পারি—‘যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ’।

পেছনের জ্যাকেটে মুদ্রিত হয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত প্রচারবার্তা (blurb) ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিক বাণীর অংশবিশেষ (অনূদিত) :

‘‘[শ্রী]রামকৃষ্ণ এসেছিলেন এই আজকের যুগধর্মকে প্রচার করতে, যে-ধর্ম ধ্বংসাত্মক নয়, সৃজনাত্মক। এই কারণে তাঁকে নতুন করে ফিরে যেতে হয়েছিল প্রকৃতির কোলে, সেখান থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সব তথ্য, এবং পেয়েছিলেন এক বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মকে যা কখনও আমাদের বলে না ‘বিশ্বাস করো বা মেনে নাও’, বরং বলে, ‘নিজে করে দেখো’, ‘আমি করে দেখেছি, তুমিও চাইলে করে দেখতে পারো।’’

এবারে পাতা উলটে বইয়ের সামনের (front) এবং পেছনের (back) পুস্তানির (endpapers বা endsheets) দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সাধারণত, এইসব পুস্তানি বই-বাঁধানোর কাজে লাগে বলে এগুলি একটু পুরু এবং শক্ত কাগজ দিয়ে করা হয়। এর ওপরে কিছুই ছাপা হয় না, এগুলি খালিই রেখে দেওয়া হয়। লেখক কিন্তু এই পুস্তানিকেও কাজে লাগিয়েছেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত চারটি পুণ্যতীর্থের (লেখকের ভাষায়—‘চারধাম’) ছবি ছাপা হয়েছে—সামনের পুস্তানির দুদিকে যথাক্রমে কামারপুকুর (বাল্যলীলাধাম) ও দক্ষিণেশ্বরের (মধ্যলীলাধাম) ছবি এবং পেছনের পুস্তানির দুইদিকে যথাক্রমে কাশীপুর (অন্ত্যলীলা-ধাম) এবং বেলুড় মঠের (নিত্যলীলাধাম) ছবি দেওয়া হয়েছে।

## ‘ছায়া কায়া, ঘট পট সমান’

এবারে মূল বইয়ের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের অভিনব তীর্থযাত্রা শুরু হোক। মুদ্রিত ৬৩৯-টি ছবির বিস্তৃত পরিচয় তো দেওয়া সম্ভব নয়, তাই কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছবিকে বেছে নিচ্ছি। প্রথমেই স্বয়ং ঠাকুরের ছবি দিয়ে শুরু করা যাক। প্রশ্ন উঠতে পারে—ঠাকুরের মোট কটি ছবি তোলা হয়েছিল? শ্রীরামকৃষ্ণ-গবেষক স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজীর (১৯১৩-২০০০) মতে অন্তত ছ-বার।[৪] স্বামী নির্বাণানন্দজীও ঠাকুরের আলোকচিত্র ও প্রস্তরমূর্তি সম্বন্ধে বেশ

কিছু অজানা তথ্য উপহার দিয়েছেন।[৫] এগুলির মধ্যে ঠাকুরের জীবদ্দশায় ক্যামেরায় তোলা তিনটি আলোকচিত্র সুপরিচিত :

১। ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯, কেশবচন্দ্র সেনের বাসগৃহে ('কমল কুটির') দীর্ঘদেহী ঠাকুরের প্রথম ছবি তোলা হয়েছিল (অ্যালবামের পৃঃ ১৩৯)।[৬]

২। ১০ ডিসেম্বর ১৮৮১, রাধাবাজারের বেঙ্গল ফোটোগ্রাফার্স স্টুডিওতে ঠাকুরের দ্বিতীয় ছবিটি তোলা হয়েছিল (অ্যালবামের পৃঃ ১৬৭)।

৩। দক্ষিণেশ্বরে রাধাকান্তের মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে উপবিষ্ট এবং গভীর সমাধিমগ্ন ঠাকুরের ছবিটি তুলেছিলেন বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড কোম্পানির অবিনাশচন্দ্র দাঁ (১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারির পরে কোনও একদিন। মতান্তরে, ১৮৮৩ সালের অক্টোবরে)। এটি দেখে ঠাকুর নিজেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, ছবিটি নিজের মাথায় কয়েকবার ছুঁইয়ে বলেছিলেন, ''ফটোখানি বেশ তুলেছে। এর ভাব অতি উচ্চ। তাঁতে [পরব্রহ্মে] একেবারে লীন হয়ে গিয়েছে। এতে তাঁরই স্বরূপ ফুটে উঠেছে।" আমাদের ভাগ্য ভাল—'নিরোধন সমাহিতমন' ঠিক কেমন হয় তা আমরা নিরখি তাঁর কৃপায়। এই ছবিটিই বিশ্বের সর্বত্র পূজিত হয়।[৭]

মূল নেগেটিভের ছ-টি কপি ছিল। তার একটি কপি শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে নিত্যপূজা করতেন। মা অমরধামে চলে যাওয়ার পরে এটি উদ্বোধনের ঠাকুরঘরেই থেকে যায় এবং নিত্যপূজিত হয়। শতাধিক বছরের পুরনো এই ফোটোটি স্বাভাবিক ভাবেই কালের করাল কবলে পড়ে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তাই ১৯৮০ সালে এই ছবিটি থেকে আবার একটি নেগেটিভ তোলানো হয়। সেটি চেতনানন্দজী ১৯৮২ সালে আমেরিকায় নিয়ে যান। তাঁর অনুরোধে বিশিষ্ট আলোকচিত্র-বিজ্ঞানী মি. জন হেঞ্চ (১৯০৮-২০০৪), যিনি তখন ডিজনিল্যান্ডের সহাধ্যক্ষ এবং সৃজনশীলতা বিভাগের প্রধান ছিলেন, দু-বছর ধরে অত্যন্ত ধৈর্য এবং যত্ন সহকারে কাজ করে নেগেটিভটির স্বাভাবিক অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ রেখে একে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করেন। এইভাবে, ছবিটি—যা মূল ছবির সবচেয়ে কাছাকাছি—পুনর্নির্মিত হয়েছিল (অ্যালবামের পৃঃ ৩৫)।[৮]

স্বয়ং ঠাকুর মূল আলোকচিত্রটিকে অনুমোদন করে শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, ''...এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। মাইরি বলছি—বাপান্ত দিব্যি।" বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এখানে ঠাকুর জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমার পূজা হবে'। যে-ঠাকুর এমনিতে 'আমি', 'আমার' বলতে পারতেন না, এখানে তিনি 'বাপান্ত দিব্যি' দিয়ে আত্মপরিচয় দিলেন।[৯]

এই ছবিটির প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন শ্রীশ্রীমাও। স্বামী অরূপানন্দজী জানতে চেয়েছিলেন, ''মা, তোমার কাছে এই যে ঠাকুরের ফটো রয়েছে এখানি বেশ।... আচ্ছা, এখানি কি ঠিক?

''মা—এটি খুব ঠিক ঠিক। ওখানি এক ব্রাহ্মণের ছিল। প্রথম কখানি যেমন উঠান হয়। [তার থেকে] একখানি সে ব্রাহ্মণটি নিয়েছিল। আগে এখানি খুব কাল (deep) ছিল—ঠিক যেন কালীমূর্তিটি, তাই ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়েছিল। সে ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বর থেকে কোথায় যাবার সময় ওখানি আমার কাছে রেখে যায়। আমি এখানি অন্যান্য ঠাকুর-দেবতার ছবির সঙ্গে রেখে দিয়েছিলুম—পূজা করতুম। নহবতের নীচের ঘরে থাকতুম। একদিন ঠাকুর [নহবতে] গিয়েছেন। [নিজের] ছবি দেখে বলছেন, 'ওগো, তোমাদের আবার এসব কি?' আমরা (বোধ হয় মা ও লক্ষ্মী দিদি) ও পাশে সিঁড়ির নীচে রাঁধছি। তারপর দেখলুম, বিল্বপত্র আর কি কি, যা পূজার জন্য ছিল, [সেসব ঠাকুর] একবার না দুবার ঐ ছবিতে দিলেন—পূজা করলেন। সেই ছবিই এই [ছবি]। সে ব্রাহ্মণ আর ফিরে এল

না। এখানি আমারই রইল।"[১০]

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা তাঁর সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী অরূপানন্দজীকে বলেছিলেন, ''...এখানকার লোক সব সেয়ানা—[ঠাকুরের] ছবিটি তুলে নিয়েছে।... কোন্ অবতারের ছবি আছে, বা কথাবার্তা এই রকম করে লেখা আছে?"[১১] আমরা আমাদের সেইসব 'সেয়ানা'—মানে বুদ্ধিমান, দূরদর্শী—পূর্বজদের কাছে চিরঋণী রইলাম। কারণ, ঠাকুর নিজের ছবি তোলাতে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু, কিছু 'সেয়ানা' ভক্ত (তাঁদের মধ্যে স্বয়ং নরেন্দ্রনাথও আছেন) নিজেরা আমটি খেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মুখ মুছে বসে থাকার পাত্র ছিলেন না, ঠাকুরের আপত্তিকে একরকম অগ্রাহ্য করেই তাঁর ছবি তুলে রেখেছিলেন। আর, তাই আমরা আজ সন্দেহাতীতভাবে জানতে পারছি, ঠাকুর ঠিক কেমন দেখতে ছিলেন। ঠাকুরের ক্ষেত্রে অন্তত আমাদের কোনও কল্পনাপটু শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রপট বা নির্মিত মূর্তির সহায়তা নিতে হচ্ছে না।

অরূপানন্দজী যেন আমাদের সকলের হয়ে মাকে প্রশ্ন করেছিলেন—''ছবিতে কি ঠাকুর আছেন?" মায়ের নিশ্চয়াত্মক উত্তর—''আছেন না? ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁর ছায়া।"

পুনরায় তাঁর—এবং সেইসঙ্গে আমাদেরও—ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—''সব ছবিতে তিনি আছেন?" মায়ের উত্তরটি সত্যিই অভিনব—'হাঁ, [ঠাকুরকে] ডাকতে ডাকতে ছবিতে তাঁর আবির্ভাব হয়।"[১২]

আমাদের মনে হয়, মা এখানে বলতে চেয়েছিলেন যে ঠাকুরের সব ছবিতেই যে ঠাকুর স্বয়ং রয়েছেন তা ঠিক। কিন্তু, আমরা যদি ঠাকুরের কোনও একটি ছবি নিয়ে সেই ছবিতে তাঁর সাক্ষাৎ উপস্থিতি অনুভব করতে চেষ্টা করি, সেই ছবির সামনে গিয়ে তাঁকে ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে ডাকতে আরম্ভ করি, তাহলে মায়ের অমোঘ আশ্বাসবাক্য অনুসারে, আমাদের কাছে ঠাকুরের আবির্ভাব হবে

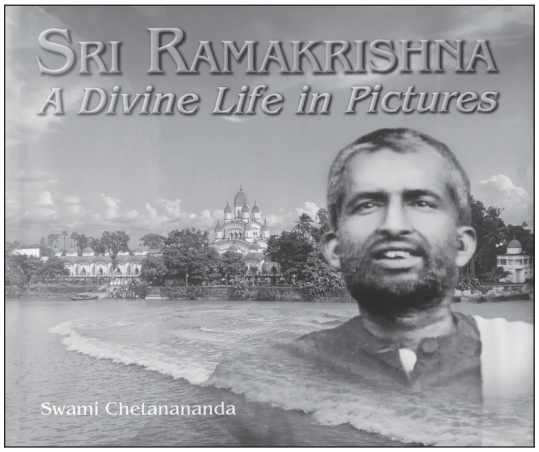


সেই বিশেষ ছবিটিতেই।

এই কথাও ঠিক, ঠাকুরের এইসব আলোকচিত্র তোলা হয়েছিল তাঁর জীবনের শেষের দিকে, তখন তাঁর সাধনাকালীন দিব্য অঙ্গকান্তি অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। তাঁর যৌবনকালের বা সাধনকালের কোনও আলোকচিত্র তোলা হয়নি। সেই সময়ে ঠাকুরকে কেমন দেখতে ছিল তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় শ্রীশ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণে—''তাঁর গায়ের রং যেন হরিতালের[১৩] মতো ছিল—সোনার ইষ্ট-কবচের সঙ্গে গায়ের রং মিশে যেত।... দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে।"[১৪] এই বিষয়ে মায়ের আর একটু বিশদ বক্তব্য পাওয়া যায় মায়ের সাক্ষাৎ শিষ্য পূজনীয় স্বামী সারদেশানন্দজীর স্মৃতিচারণায়—''মা বলতেন, 'ঠাকুরের গায়ের রং অতীব সুন্দর, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল। দাঁতের ওপরের পাটির মধ্যে যেটুকু ফাঁকের মতো দেখায় তা কালো দাগ [এই অ্যালবামের ১১৭]। সাধনের কালে ঠাকুরের নাক থেকে কালো রক্ত নিঃসরণ হয়েছিল। দাঁতে লেগে তাতে এই স্থায়ী দাগ পড়ে।' "[১৫]

এছাড়া ভক্তপ্রবর ডা. রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় একবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঠাকুরের একটি ছবি তুলিয়েছিলেন। সেই ছবিটি কোন চিত্রগ্রাহক

কোথায় কখন ও কীভাবে তুলেছিলেন তা আজ আর জানার কোনও উপায় নেই। আমরা শুধু জানি, সেই ছবিটির প্রিন্ট দেখে ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, ''আমি কি এত রাগী নাকি?'' কথাটা শুনে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ডা. দত্ত সেই ছবিটি (নেগেটিভ সমেত) গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়েছিলেন। ততোধিক মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-গবেষক স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজী লিখেছেন, আজ ভক্তরা ডা. দত্তর সুগভীর গুরুভক্তির প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অপছন্দ-করা ছবিটি দেখার সুযোগ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে মনে মনে আক্ষেপও করবেন। এমনিতেই তো ঠাকুর নিজের ছবি তোলবার জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না, তার ওপর ফোটোগ্রাফির সেই শৈশবাবস্থায় যখন প্রতিকৃতি-ছবি (portrait) তোলা খুবই কঠিন এবং ব্যয়বহুল কাজ ছিল, তখন অনিচ্ছুক ঠাকুরের আর একটি অমূল্য ছবি এইভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়। এই হারিয়ে-যাওয়া ছবিটিকে ঠাকুরের চতুর্থ আলোকচিত্র (ক্যামেরাধৃত) বলা যেতে পারে।

ঠাকুরের দেহান্তের পরে তাঁর রোগজীর্ণ মরদেহের দুটি আলোকচিত্র তোলা হয়েছিল (শোকে মুহ্যমান ভক্ত-শিষ্যদের সঙ্গে)। এই বইতে সেই মর্মান্তিক বেদনাদায়ক চিত্রদ্বয় মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু ভক্তদের মর্মযন্ত্রণার কথা অনুমান করে লেখক ঠাকুরের পবিত্র মরদেহটি ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়েছেন। লেখক জানিয়েছেন, এখানে কোনও নতুন ফুলের ছবি ব্যবহার করা হয়নি। মূল ছবিতে যেসব ফুলের ছবি ছিল তারই কয়েকটি কপি-পেস্ট করে দেওয়া হয়েছে।

এই সূত্রে শ্রদ্ধেয় শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মন্তব্য শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করতে চাই। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (প্রথম খণ্ড) পড়বার পর এক অর্বাচীন তরুণ পাঠক ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিল—''আপনার বইতে ঠাকুরের মরদেহের ছবি ছাপা হয়নি কেন?'' উত্তরে প্রবীণ অধ্যাপক একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে (তারিখ : ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮) লিখেছিলেন,

''...শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পরে তোলা ছবি এখন কলকাতার নানা জায়গায় বিক্রি হয় দেখেছি। আমি নিজে বহু বছর আগেই (ইশারউডের বই বেরুবার আগেই) তা দেখেছি। ছবিটি ছাপবার ইচ্ছা আমার হয়নি—'ঠাকুরের মৃত্যু নেই'—এই কারণে নয়—...ঠাকুরের বিধ্বস্ত শরীর আমাকে বেদনা দেয়। কী জানেন, ঠাকুরের রূপ মনে আনতে চাই—তাঁর রহস্যগভীর মুখচ্ছবি কিংবা সমাধির অপূর্ব হাসির আলো, কোট ও চটি পরা তাঁর চেহারাটি, সুসজ্জিত তিনি, কিন্তু কাঁধে উঠে-পড়া কোঁচাটি তাঁর সব সজ্জাকে ব্যঙ্গ করে সদা-বিহ্বল রূপটি ধরিয়ে দিচ্ছে —এখানে দেহান্ত-পরের ছবিকে আনতে চাইনা। এ হয়ত আমার মনের দুর্বলতা। দুর্বলতা ক্ষমা চায়।''

'অভাবনীয় ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত...'

বইটির প্রতিটি পাতাতে ঠাকুরের জীবনলীলার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় প্রতিটি ব্যক্তি, স্থান ও বস্তুর পরিচিত ছবিগুলি তো রয়েছেই, উপরন্তু রয়েছে অনেক দুষ্প্রাপ্য (বা অপ্রাপ্যও বলা যায়) ছবি যেগুলি আমাদের বিস্মিত করে। কয়েকটি বিশেষ ছবির কথা বলা যেতে পারে।

এক, এর মধ্যে বেশ কিছু স্থান বা বস্তু কালের কবলে পড়ে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাস্তবে সেগুলি দেখার আর কোনও উপায় নেই, কিন্তু এই অ্যালবামে তাদের চিত্ররূপটি চিরতরে বিধৃত রইল ভক্তদের অনুধ্যানের জন্য। তিনটি উদাহরণ দিচ্ছি।

যে-পবিত্র ঢেঁকিঘরে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং যেটি অনেক বছর আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেই ঢেঁকিঘরের এবং সেই একই স্থানে নির্মিত (১৯৫১ সালে) ঠাকুরের সুরম্য মন্দিরের ছবি

অ্যালবামে আমরা দেখতে পাচ্ছি (পৃঃ ২০, ২১)।

'সম্ভবত ১২৭০ সালে' দক্ষিণেশ্বরে সমাগত 'জটাধারী' নামক এক রামাইত সাধুর কাছে ঠাকুর রাম-মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন 'শ্রীশ্রীরামলালা' নামক বালকবেশী শ্রীরামচন্দ্রের একটি অষ্টধাতু-নির্মিত বালবিগ্রহ। সেই মূর্তিতে ঠাকুর সত্যিকারের রক্তমাংসের রামলালাকে দেখতে পেতেন বাৎসল্যভাব সাধনকালে। পরবর্তী কালে রামলালার সেই মূর্তিটি চুরি হয়ে গেছে, সেটি আমরা আর কোনওদিনই দেখতে পাব না। কিন্তু তার আলোকচিত্রটি এই অ্যালবামে স্থায়ীভাবে থাকল (পৃঃ ৬৪)।

পটলডাঙার গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কামারহাটিতে গঙ্গার তীরে রাধাগোবিন্দের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (পৃঃ ১২৬)। সেই ঠাকুরবাড়ির পুরোহিত নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বালবিধবা বোন অঘোরমণি দেবী আমাদের কাছে 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী (বামনী)' এবং 'গোপালের মা' নামে সুপরিচিতা। গোবিন্দবাবুর ঠাকুরবাড়িতেই 'মেয়েমহলের একটি ঘরে' গোপালের মা বসবাস করতেন। সেই ঘরের ছবি তোলার জন্য লেখক একজন চিত্রগ্রাহককে নিয়ে কামারহাটিতে গিয়েছিলেন (২৭ ডিসেম্বর ১৯৭০)। সেখানে গিয়ে তাঁরা শুনলেন যে ওই ঠাকুরবাড়ির সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা চলছে, আদালতের অনুমতি ছাড়া সেখানে প্রবেশ করা যাবে না। নিরুপায় লেখক তখন চিত্রগ্রাহককে নিয়ে পেছনের একটি জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে 'গোপালের মা'য়ের ঘরের ছবি তুলে রাখলেন। জীর্ণ ঘরটি পরে ভেঙে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু তার আলোকচিত্রটি মহারাজের তৎপরতায় এই অ্যালবামে রয়ে গেল (পৃঃ ১২৬)।

দুই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়, কিছু কিছু স্থানের রূপ আবার আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। লেখক আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, যথাসম্ভব সেইসব স্থানের আধুনিক রূপের পাশাপাশি তার প্রাচীন রূপেরও আলোকচিত্র দিতে। এর ফলে আমরা জানতে পারছি, কামারপুকুরে ঠাকুরের পৈতৃক নিবাসের রূপ ১৯৩০ সালে কেমন ছিল (পৃঃ ৪৬) এবং ১৯৩৬ সালে কেমন ছিল (পৃঃ ১৪, ১৮)।

ঠাকুরের পরিবারের পারিবারিক উপাসনালয়ের প্রাচীন রূপ (১৯২০ সাল নাগাদ) এবং বর্তমান রূপ আমরা পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি (পৃঃ ১৫)। ঠাকুরের পিতৃদেব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পূজিত 'রঘুবীর' নামক শালগ্রাম শিলার (পৃঃ ১৪) ছবির সঙ্গে রয়েছে তাঁদের পরিবারে পূজিত একাধিক দেববিগ্রহের ছবি—মা লক্ষ্মীর ঘট, মা শীতলার ঘট, ছোট শালগ্রাম শিলা ('রঘুবীর'), বড় শালগ্রাম শিলা ('নারায়ণ'), রামেশ্বর শিবলিঙ্গ ও গোপালের পিতলমূর্তি (পৃঃ ১৫)।

ঠাকুরের সাধনভূমি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের 'পঞ্চবটী' ('পঞ্চবটী' মানে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকী ও অশোক—এই পাঁচ রকমের গাছ দিয়ে রচিত বন)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই 'পঞ্চবটী' অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। এই অ্যালবামে বিভিন্ন সালের 'পঞ্চবটী'-র পাঁচটি আলোকচিত্র রয়েছে, তার মাধ্যমে আমরা এই পরিবর্তনটা কিছুটা বুঝতে পারি—১৮৯৬ সাল (পৃঃ ৫৮), ১৯৩০ সাল (পৃঃ ৬০), ১৯৩৫ সাল (পৃঃ ৬১), ১৯৫০ সাল (পৃঃ ৫৯), ১৯৭৭ সাল (পৃঃ ৫৯)। এদের মধ্যে ১৯৩০ সালের (পৃঃ ৬০) এবং ১৯৩৫ সালের (পৃঃ ৬১) 'পঞ্চবটী'র দুটি পাতাজোড়া ছবি রয়েছে। এই ছবি দুটি ঘরের বাইরে গিয়ে সূর্যের আলোতে কিছুক্ষণ দেখলে শরীরে শিহরণ জাগবে, মনে হবে আমরাও যেন সেই প্রাচীন, নির্জন, নিস্তব্ধ তপোভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

আজ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার এবং

চাঁদনি দেখে আমরা জানতেও পারব না যে সেসব তৈরি হয়েছিল গ্রিকো-রোমান শৈলীতে (পৃঃ ৬৪, ১১৩), বর্তমানে অবশ্য সেগুলি আধুনিক নির্মাণশৈলীতে পুনর্নির্মিত হয়েছে।

তিন, কিছু স্থান বা বস্তু আছে যেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ (বা, যা আমরা সহজে দেখতে পাই না), সেইসব স্থানের বা বস্তুর ছবি আমরা এই অ্যালবামে পাচ্ছি।

গোবিন্দজীর ভেঙে-যাওয়া বিগ্রহকে শ্রীরামকৃষ্ণ জুড়ে দিয়েছিলেন। সেই ভগ্নবিগ্রহ এবং তাঁর জোড়া-দেওয়া পায়ের ছবি এই অ্যালবামে দেখতে পাওয়া যাবে (পৃঃ ৩৪)। এছাড়া মন্দিরে পূজিত রাধাকৃষ্ণের ছবি (পৃঃ ১০৫) এবং শ্রীকৃষ্ণের শয্যার ছবিও (পৃঃ ১০৫) রয়েছে।

বেলুড় মঠে ঠাকুরের মন্দিরের তিনতলায় রয়েছে তাঁর শয়নকক্ষ। সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার নেই। সেই শয়নকক্ষের ছবি আমরা এখানে পাচ্ছি (পৃঃ ২১৬)।

আমরা জানি, ঠাকুর যখন কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে (১৮৮৬ সালে) রোগশয্যায় শায়িত তখন বুড়োগোপাল দাদা (ঠাকুরের প্রবীণতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী অদ্বৈতানন্দজী) বারোটি গেরুয়াবস্ত্র এবং বারোটি রুদ্রাক্ষের মালা এনেছিলেন সাধুদের দেওয়ার জন্য। ঠাকুর সেগুলি স্বহস্তে তাঁর সংসারত্যাগী ভাবী সন্ন্যাসী শিষ্যদের দিয়েছিলেন। এর মধ্যে যে-গৈরিক বস্ত্র এবং রুদ্রাক্ষের মালাটি লাটু মহারাজ পেয়েছিলেন সেটি কালের কবলে পড়ে নষ্ট হয়নি, তাদের ছবি রয়েছে ১৮০ পৃষ্ঠায়।

এছাড়া, ঠাকুরের ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্রের ছবি এবং অন্যান্য কিছু স্মারকচিহ্নের (memento) ছবিও দিয়েছেন লেখক (পৃঃ ২১৩-২২৩)।

চার, ঠাকুরের জীবনীগ্রন্থে আমরা অনেক নরনারীর কথা পাই, যাঁদের আমরা কেবল নামে চিনি, কিন্তু তাঁদের কেমন দেখতে ছিল তা আমরা জানি না। এইরকম কিছু মানুষের আলোকচিত্র আমরা এখানে পাচ্ছি। যেমন, ঠাকুরের দুই বাল্যবন্ধু ('স্যাঙাৎ') গয়াবিষ্ণু লাহা এবং হারাধন দত্ত (পৃঃ ২২), ঠাকুরের পিতৃবন্ধু ধর্মদাস লাহার ধর্মপ্রাণা কন্যা প্রসন্নময়ী দেবী (পৃঃ ২৬), রানি রাসমণির কন্যা ও মথুরবাবুর পত্নী জগদম্বা দাসী (পৃঃ ১২১)।

ভবরোগবৈদ্য ঠাকুরের পার্থিব শরীর কখনও রোগাক্রান্ত হলে তাঁকে বৈদ্য এবং চিকিৎসকদের চিকিৎসাধীন থাকতে হত। সেইসব সৌভাগ্যবান চিকিৎসকদের কয়েকজনের ছবি আমরা এখানে পাচ্ছি : কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এবং তাঁর ভ্রাতা কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন (পৃঃ ৬৬), হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ড. মহেন্দ্রলাল সরকার (পৃঃ ১৮৪), কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল, কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ড. রাজেন্দ্রলাল দত্ত ও ড. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক ড. রাখালদাস ঘোষ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং মিলিটারি সার্জেন ড. জন মার্টিন কোট্‌স্ (পৃঃ ১৮৭)।

স্বামী প্রভানন্দজী অনেক আগেই ঠাকুরের সুন্দর হস্তাক্ষরের কিছু নমুনা দিয়েছিলেন।[১৬] চেতনানন্দজীও এই অ্যালবামে ঠাকুরের হস্তলিপির নমুনা দিয়েছেন (পৃঃ ১৯২, ২১৫)।

'যথাগ্নের্দাহিকাশক্তী রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা...'

ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি অভিন্ন। ঠাকুর আর মা আলাদা নন। তাই ঠাকুরের ছবির অ্যালবাম প্রস্তুত করতে গিয়ে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাকে ভুলে যাননি লেখক। শ্রীশ্রীমায়ের সুপরিচিত এবং আমাদের নিত্য-আরাধিত দুটি ছবি (১৮৯৮ সালের) এখানে রয়েছে (পৃঃ ৪৩, ৭১)। লেখক জানিয়েছেন তিনি মায়ের মূল ছবিটি পেয়েছিলেন মায়ের সেবক পূজনীয় স্বামী ঈশানানন্দজীর থেকে। অর্থাৎ এখানে আমরা মায়ের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ছবির মুদ্রিত

রূপটি দেখতে পাচ্ছি (পৃঃ ৭১)। এছাড়াও, জয়রামবাটী এবং আরও অনেক কিছুর ছবি রয়েছে এখানে, যা আমাদের মাতৃস্মরণের পরম সহায়ক হবে। এই সূত্রে স্মরণ করছি, আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে পূজনীয় লেখকের কাছ থেকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের দিব্যজীবন ও বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের চিত্র-সম্বলিত একটি দৃষ্টিনন্দন অ্যালবাম পেয়েছিলাম।[১৭] এখন পেলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারলীলার চিত্র-সম্বলিত অনুরূপ একটি অ্যালবাম। আমাদের একান্ত আশা, অদূর ভবিষ্যতে আমরা মহারাজের কাছ থেকে শ্রীশ্রীমার মানব-লীলার চিত্র-সম্বলিত একটি অ্যালবামও পাব।[১৮]

## উপসংহার

আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস, অচিরেই এই বইটি হয়ে দাঁড়াবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধনসঙ্গী এবং সেই কারণে, শীঘ্রই এর নতুন সংস্করণ মুদ্রণের প্রয়োজন হবে। পরবর্তী সংস্করণের জন্য আমাদের কয়েকটি পরামর্শ রইল।

এক, দ্বাদশ অধ্যায়টির নাম (পৃঃ ১৯৯-২১২) 'তাঁর প্রেরণাধারা সতত প্রবহমান' ('His Spirit Continues to Flow')। এটি নানা কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তিনজন ভারতীয় নেতার ছবি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক কিছু উক্তির উদ্ধৃতি (আংশিক) দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ২০৪)। আমাদের বেদনার্ত প্রশ্ন, এখানে সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর (১৮৯৭-?) কথা নেই কেন? নেতাজী তো নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের পদাশ্রিত বলে পরিচয় দিতেন। তাঁর মতো আন্তর্জাতিক-স্তরের দেশনেতা এবং সেনানায়ককে বাদ দেওয়ার তো কোনও কারণ থাকতে পারে না। আমাদের অনুরোধ, পরবর্তী সংস্করণে এই বিচ্যুতির নিরাকরণ করা হোক।

দুই, 'খালিপেটে ধর্ম হয় না', দেহধারী ভগবানকেও আহার করতে হয়। ঠাকুরের জীবনী থেকে আমরা দেখেছি, তিনি ঔদরিক ছিলেন না, কিন্তু ভোজনরসিক (gourmet) ছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূকে রান্নায় 'শুয়োর গোঙানো' ফোড়ন দিতে বলতেন। অল্পবয়সি এবং অনভিজ্ঞা শ্রীশ্রীমায়ের তৎকালীন রান্না পছন্দ না হলে তাঁর রান্নাকে সোজাসুজি 'ছিনাথ সেনের রান্না' বলে দিতেন! লেখক যখন ঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই অ্যালবামটি প্রস্তুত করেছেন, তখন তিনি এই বিষয়টা বাদ দিলেন কেন? ঠাকুর কী কী খেতেন বা তিনি কী কী খেতে ভালবাসতেন (যেমন—'লাটসাহেবের গাড়ি' জিলিপি, কচুরি, লেমোনেড, পালো-দেওয়া ক্ষীর, দুধের সর) তার ছবি দিতে পারতেন। সেইসঙ্গে, তিনি যেসব মুখশুদ্ধি ব্যবহার করতেন (পান, সুপুরি, কাবাবচিনি) তারও ছবি থাকলে ভাল হত।

তিন, এইরকম একটি সযত্ননির্মিত বইতে কোনও মুদ্রণপ্রমাদ থাকে না। তাও, একটি ছোট ভুল চোখে পড়ল—একটি চিত্রের (পৃঃ ৬৭) পরিচিতিতে (caption) ছাপা হয়েছে—'(Sadan-kutir)'। বলা বাহুল্য, সেটি '(Sadhan-kutir)' হবে।

চার, আগেই বলেছি, মহারাজ তাঁর বিপুল সংগ্রহ থেকে মাত্র ছশো ঊনচল্লিশটি ছবি (অর্থাৎ, তাঁর মূল সংগ্রহের ৬.৩৯%) এই বইতে দিয়েছেন। আমাদের ব্যাকুল প্রশ্ন—আমাদের ভাগ্যে কি এর বেশি ছবি-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই? অবশ্য একথাও ঠিক যে বইতে আরও বেশি সংখ্যক ছবি দিতে চাইলে মুদ্রণের খরচও সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। তবে, এইসব দুর্লভ চিত্ররাজি সেন্ট লুইস বেদান্ত কেন্দ্রের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করা যেতে পারে।

পাঁচ, এই বইটিতে বহু বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই, পাঠকের সুবিধার্থে বইয়ের শেষে একটি বিষয়ভিত্তিক সূচি (Subject Index) থাকা

একান্ত প্রয়োজন।

ছয়, অবিলম্বে এই মহাগ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হোক—বাঙালি পাঠকসমাজের পক্ষ থেকে এই অনুরোধটি বিনীতভাবে জানিয়ে রাখলাম।

## তথ্যসূত্র


১। Photographs of SRI RAMAKRISHNA-SARADA DEVI, Researched by Swami Vidyatmananda and Dr. (Ms.) Purba Sengupta, Sri Ramakrishna Math, Chennai, 2003)

২। *আলোকচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবী*, গবেষণায় : মিতা মজুমদার ও স্বরাজ মজুমদার, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৬

৩। কানাডার একটি প্রেস থেকে শুধুমাত্র বইটি ছাপাতেই খরচ হয়েছে ষাট হাজার আমেরিকান ডলার (প্রায় চুয়াল্লিশ লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা)। লেখক চেয়েছিলেন, সর্বোত্তম প্রেস থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই বইটি ছাপা হোক।

৪। Swami Vidyatmananda, *Illustrating a New Biography of Ramakrishna* (illustrated), *Prabuddha Bharata*, Vol. LXX, March 1965, pp. 115-7

৫। স্বামী নির্বাণানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি সম্বন্ধীয় দু-একটি তথ্য*, উদ্বোধন, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ১২, পৌষ, ১৩৬৯, পৃঃ ৬৫৫-৬

৬। ঠাকুরের দৈহিক উচ্চতা (আনুমানিক) ছিল ৫ ফুট ৯.২৫ ইঞ্চি (১.৭৬ মিটার)

৭। হায়দরাবাদের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের শয়নকক্ষে তাঁর শিয়রের কাছের দেওয়ালে সমাধিমগ্ন ঠাকুরের এই ছবিটি ঝোলানো থাকত। একবার পূজনীয় মহারাজ বিছানায় শায়িত অবস্থায় আলোচককে এই ছবিটি দেখিয়ে একান্তে বলেছিলেন, ''ঠাকুরকে ধ্যান করতে গেলে এই ছবিতেই ধ্যান করতে হবে, কারণ এর মধ্যেই ঠাকুরের পূর্ণ প্রকাশ রয়েছে।''

৮। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদনা), *শতরূপে সারদা*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৯৮৬, আর্টপ্লেট (পৃঃ ১২ এবং ১৩-র মধ্যে)

৯। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮০, ভাগ ২, পৃঃ ৯৭

১০। তদেব, পৃঃ ৫০-৫১

১১। তদেব, পৃঃ ৯৮

১২। তদেব, ৫৭-৫৮

১৩। 'হরিতাল' (Orpiment) হল উজ্জ্বল কমলা-হলদে রঙের এক আকরিক, যার রাসায়নিক নাম arsenic sulphide ($As_2S_3$)

১৪। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৩৮০, পৃঃ ৫১

১৫। স্বামী চেতনানন্দ (সঙ্কলক ও সম্পাদক), *প্রাচীন সাধুদের কথা*, খণ্ড ২, উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ৮২

১৬। স্বামী প্রভানন্দ (সম্পাদনা), পুঁথি (শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার , কলকাতা, ২০০৭

১৭। Swami Chetanananda, VIVEKANANDA : EAST MEETS WEST–a Pictorial Biography, Vedanta Society of St. Louis, USA, 1995

১৮। একটি সাক্ষাৎকারে চেতনানন্দজী তাঁর 'আগামী পরিকল্পনা'র কথা জানিয়েছেন : ''এখন শ্রীশ্রীমায়ের একটি pictorial-এর কাজ শুরু হয়েছে। সেটি নিয়ে ব্যস্ততা আছে।...'' সেই কারণে, তাঁর অন্যান্য কাজের ''...সঙ্গে এখন শ্রীশ্রীমায়ের একটি pictorial বইটির জন্যে প্রস্তুতিও নিতে হচ্ছে।''

দ্রঃ সুমন সেনগুপ্ত, স্বামী চেতনানন্দজী, *বইয়ের দেশ*, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃঃ ১১৪, ১২৩